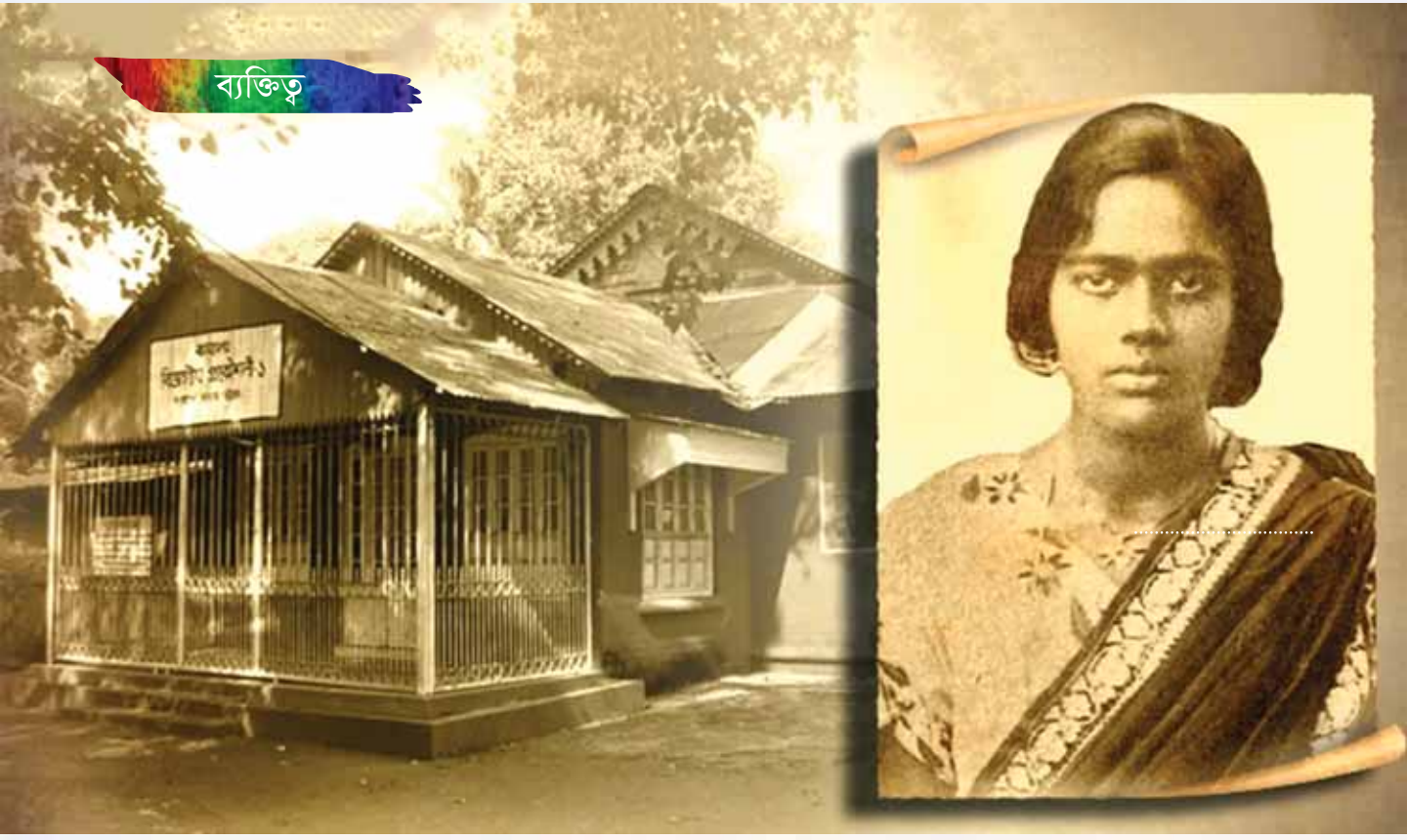

বিপ্লবের আর এক নাম প্রীতিলতা

ঋষিকা

বেগম রোকেয়া তার মুক্তিফল প্রবন্ধে লিখেছিলেন, কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব। যা যুগে যুগে প্রমাণ করেছেন হাজারও নারী। কখনো নিজেদের মেধা দিয়ে আবার প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করে কিংবা অস্ত্র তুলে নিতেও পিছু পা হননি তারা। ইতিহাস ঘাঁটলে এমন অনেক নামই সামনে চলে আসবে যারা নারী জাগরণ থেকে শুরু করে বিপ্লবেও তালে তাল মিলিয়েছেন একজন পুরুষের। তেমনই একটি নাম প্রীতিলতা। যিনি ছিলেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আত্মাহুতি দানকারী একজন বাঙালি। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী এই প্রীতিলতা যুগে যুগে হাজারও নারীর অনুপ্রেরণা হয়ে থেকে গেছেন।

প্রীতিলতা নাম যার

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রভাবশালী একটি চরিত্র প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় পড়াশোনা শেষ করে, তিনি ভর্তি হন কলকাতার বেথুন কলেজে। স্নাতক হন দর্শনে। পরবর্তীতে পেশা হিসেবে বেছে নেন শিক্ষকতাকে। কিন্তু প্রীতিলতা মারা যান একজন বিপ্লবী হিসেবে। তিনি 'বাংলার প্রথম নারী শহীদ' হিসেবে প্রশংসিত হয়েছেন। প্রীতিলতা সূর্য সেনের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। তিনি পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের সশস্ত্র আক্রমণে, ১৫ জনের একটি বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পরিচিত। সেই আক্রমণে সময়ে একজন নিহত ও ১১ জন আহত হন। বিপ্লবীরা ক্লাবে অগ্নিসংযোগ করেন এবং পরে ঔপনিবেশিক পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। গ্রেপ্তার এড়াতে প্রীতিলতা পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

ছোট্ট সেই রানী

প্রীতিলতার জন্ম ১৯১১ সালের মে মঙ্গলবার চট্টগ্রামের বর্তমান পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে। মিউনিসিপ্যাল অফিসের হেড কেরানি জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার এবং প্রতিভাদেবীর দ্বিতীয় সন্তান তিনি। তারা ছিলেন ছয় ভাই বোন, মধুসূদন, প্রীতিলতা, কনকলতা, শান্তিলতা, আশালতা ও সন্তোষ। তাদের পরিবারের আদি পদবী ছিল দাশগুপ্ত। পরিবারের কোনো এক পূর্বপুরুষ নবাবী আমলে 'ওয়াহেদ্দেদার' উপাধি পেয়েছিলেন, এই ওয়াহেদ্দেদার থেকে ওয়াদ্দেদার বা ওয়াদ্দার। শৈশবে পিতার মৃত্যুর পর জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার তার পৈতৃক বাড়ি ডেঙ্গাপাড়া সপরিবারে ত্যাগ করেন। তিনি পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে মামার বাড়িতে বড় হয়েছেন। সেই বাড়িতেই জন্মে ছোট্ট প্রীতিলতা। আদর করে মা প্রতিভাদেবী তাকে 'রানী' ডাকতেন। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম শহরের আসকার খানের দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে টিনের ছাউনি দেওয়া মাটির একটা দোতলা বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকতেন ওয়াদ্দেদার পরিবার। অন্তর্মুখী, লাজুক এবং মুখচোরা স্বভাবের প্রীতিলতা ছেলেবেলায় ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা ইত্যাদি কাজে মা-কে সাহায্য করতেন।

প্রীতিলতার জীবনের নারীরা

একটা সময় মেয়ের গায়ের রঙ কালো বলে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন প্রীতিলতার আত্মীয়স্বজনরা। অথচ কেই বা জানতো এই মেয়ে দেশের এক অগ্নিকন্যা হিসেবে যুগে যুগে অমর হয়ে থাকবেন! কিন্তু প্রীতিলতার মা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন তার ভেতরে থাকা প্রতিবাদী চরিত্র। তাই সবাই যখন কালো বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল, তখন সবার চোখে চোখ রেখে প্রীতিলতার মা

সবাইকে বলেছিলেন, 'আমার এই কালো মেয়েই একদিন তোমাদের মুখ আলো করবে'। প্রীতিলতার প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়। পড়াশোনায় ভালো হওয়ায় প্রীতিলতা ছিলেন শিক্ষকদের প্রিয়। বিশেষ করে তার ইতিহাসের শিক্ষিকা ঊষাদির সাথে তার ছিল খুব ভাল সম্পর্ক। এই ঊষাদিই একদিন প্রীতিলতাকে 'ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই' নামের একটি বই পড়তে দেন। বইটি প্রীতিলতা ও তার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু কল্পনা দত্তের মনোজগতকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। আর এই ঝাঁসির রানিই তার মনে বিপ্লবের বীজ বুনে দিতে থাকে ধীরে ধীরে।

বিপ্লবের সাহচর্য

১৯২৩ এর ১৩ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামের টাইগার পাস নামক জায়গায় কর্মচারীদের বেতনের জন্য নিয়ে যাওয়া ১৭,০০০ টাকা ছিনতাই এর দায় চলে যায় বিপ্লবী নেতা সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর উপরে। তাদের বিরুদ্ধে আনা হয় রেলওয়ে ডাকাতির মামলা। এই ঘটনার পরের বছরেই বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স নামক এক জরুরি আইনে বিনা কারণে বিপ্লবী সদস্যদের আটক করা শুরু হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় বিপ্লবীদের প্রকাশনাসমূহ। এরকম সময়ে একদিন প্রীতিলতাদের বাড়িতে আসেন তার এক দাদা পূর্ণেন্দু দস্তিদার। তিনি ছিলেন বিপ্লবী দলের একজন কর্মী। তিনি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কিছু বই প্রীতিলতার কাছে গোপনে রেখে যান। বই পেয়ে কৌতূহলবশত প্রীতিলতা সেগুলো খুলে দেখে এবং একে একে পড়ে ফেলে। বইগুলো ছিল 'বাঘা যতীন', 'দেশের কথা', 'ক্ষুদিরাম' আর 'কানাইলাল'। সেই বয়সেই বইগুলো প্রীতিলতার চিন্তাজগতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। তখন তিনি সবে দশম শ্রেণির ছাত্রী। তখন থেকেই তিনি দেশের কাজে অংশগ্রহণের কথা ভাবতে শুরু করেন। ইচ্ছার কথা সেই দাদাকে জানালে তিনি তা নাকচ করে দেন। কারণ তখন দলে কোনো নারী সদস্য নেওয়া হতো না। কিছুটা মনক্ষুণ্ন হয়ে ভাবতে থাকেন, 'দেশ তো আমারও, তাহলে আমি কেন দেশের জন্য কাজ করতে পারব না?' তবে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি তাকে। ইডেনে পড়ার সময় দৃঢ় মনোবল ও দেশের প্রতি ভালোবাসা দেখে তারই এক শিক্ষিকা তাকে দীপালি সংঘের সদস্য হওয়ার কথা বলেন এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার সময় তাকে সংঘের সদস্য হওয়ার জন্য একটা ফর্ম দেন। সেটি প্রীতিলতা দেখান তার দাদাকে। আর তার দাদা সেটা নিয়ে যান সূর্য সেনের কাছে। দীপালি সংঘের ফর্মটি দেখে সূর্য সেন বিপ্লবে মেয়েদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে প্রীতিলতাকে গোপনে দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। এদিকে ঢাকায় ফিরে দীপালি সংঘে যোগ দিয়ে ছোরাখেলা, লাঠিখেলা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন প্রীতিলতা। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে তিনি লিখেছিলেন, 'আইনে পড়ার জন্য ঢাকায় দু'বছর থাকার সময় আমি নিজেকে মহান মাস্টারদার একজন উপযুক্ত কমরেড হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়েছি।' বেথুন কলেজে পড়ার সময় প্রীতিলতা জানতে পারেন, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, চট্টগ্রামের আরেক বিপ্লবীর কথা। প্রীতিলতা শেষমেশ আরতি ছদ্মনামে রামকৃষ্ণের দূরসম্পর্কের বোনের পরিচয় নিয়ে প্রীতিলতা তার সাথে দেখা করতে যান। এরপর যতদিন রামকৃষ্ণ বেঁচে ছিলেন, ততদিনে অনেকবার গেছেন প্রীতিলতা তার সাথে দেখা করতে। রামকৃষ্ণের সাথে দেখা হওয়ার দিনগুলোর মধ্যেই প্রীতিলতা এবং কল্পনা দত্ত বেশ কয়েকবার কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে ফেরার পথে লুকিয়ে বোমার খোল নিয়ে গেছেন। পৌঁছে দিয়েছেন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের কাছে।

বিপ্লবের বিপরীতে আর্থিক অসংগতি

১৯৩২ সালে বিএ পরীক্ষার পর বাড়ি এসে প্রীতিলতা দেখেন, বাবার চাকরি নেই। এমতাবস্থায় তাকেই পরিবারের হাল ধরতে হয়। নন্দনকানন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার চাকরি পান তিনি। নিজের কাজ নিয়ে ভালোই সময় কেটে যাচ্ছিল তার। কিন্তু হাল ছাড়েননি বিপ্লবী হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে। তার মাথায় সবসময় ঘুরপাক খায় মাস্টারদার সাথে সাক্ষাতের চিন্তা। এদিকে চট্টগ্রামে থাকা কল্পনা দত্তের সাথে অনেক আগেই মাস্টারদার সাক্ষাৎ হলে কল্পনা তাকে প্রীতিলতার আগ্রহের কথা বলেন। সব শুনে মাস্টারদাও তার সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩২ সালের ১২ জুন, মাস্টারদা লোক পাঠিয়ে প্রীতিলতাকে বাড়ি থেকে আনার ব্যবস্থা করেন। সেই সাক্ষাতের সময় তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশ সেখানে হামলা করে। ছোটখাটো সেই সংঘর্ষে নিহত হন সেখানে পুলিশ ক্যাম্পের অফিসার ইন চার্জ ক্যাপ্টেন ক্যামেরন আর বিপ্লবীদের মধ্যে থাকা নির্মল সেন এবং অপূর্ব সেন। মাস্টারদা আর প্রীতিলতা সেই অন্ধকার রাতে কচুরিপানা ভর্তি পুকুরে সাঁতার কেটে, কর্দমাক্ত পথ পাড়ি দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ধ্বংস করে দেওয়া হয় সেই বাড়িটি। গ্রেপ্তার করা হয় ওই বাড়িতে থাকা পরিবারের সদস্যদের। ধ্বংস করার আগে বাড়ি তল্লাশি করে গোপন কাগজপত্র, ছবির সাথে প্রীতিলতার একটি ছবিও খুঁজে পায় পুলিশ। এতে করে বিপ্লবী দলের সাথে প্রীতিলতার যোগাযোগ বুঝে যায় তারা। এরকম অবস্থায় মাস্টারদা প্রীতিলতাকে আত্মগোপন করার পরামর্শ দিলে ৫ জুলাই বীরেশ্বর রায় এবং মনিলাল দত্তের সাথে আত্মগোপন করেন প্রীতিলতা।

প্রীতিলতার অভিযান

চট্টগ্রাম শহরের উত্তরে ইংরেজদের প্রমোদকেন্দ্র পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে প্রথমবারের হামলা সফল না হওয়ায় দ্বিতীয়বার সেখানে হামলার পরিকল্পনা করেন বিপ্লবী নেতারা। মাস্টারদা প্রীতিলতাকে জানান, ১৯৩২ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর রাতে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেত্রী তিনি। এতদিনের বাসনা পূরণ হতে যাচ্ছিল প্রীতিলতার। কিন্তু সশস্ত্র অভিযানের কোনো অভিজ্ঞতা তার নেই। তবে আছে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, দেশের জন্য আত্মত্যাগের কঠিন সংকল্প। মূল ঘটনার পূর্বে কিছুদিন কাট্টলীর সাগরপাড়ে প্রীতিলতা ও তার সঙ্গীদের অস্ত্রচালনা প্রশিক্ষণ চলে। অভিজ্ঞ নেতারা সবরকমভাবে তাদের তৈরি করতে থাকেন। আস্তে আস্তে বহু প্রতীক্ষিত দিনটি চলে আসে। প্রীতিলতা মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে থাকেন, দেশের মানুষের উদ্দেশে লিখে তার এই মরণখেলায় অংশ নেওয়া কথা। পূর্বনির্ধারিত স্থানে পজিশন নেওয়ার পর বাবুর্চির সংকেতে অপারেশন শুরু করেন প্রীতিলতা ও তার দল। যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী দলের সবাইকে আগে পাঠিয়ে পেছন পেছন হেঁটে আসতে থাকেন প্রীতিলতা। ক্লাবের বাইরে পাহারায় থাকা পুলিশেরা আক্রমণ হওয়ার সময়েই পালিয়ে যায়। গুলি ও বোমা ছুঁড়ে বেশ কিছু মানুষকে হতাহত করেন বিপ্লবীরা। ভেতরে থাকা আহত ইংরেজরাও এদিক ওদিক পালিয়ে যায়। খুব অল্প সময়েই সব ঠিকমতো শেষ হয়ে গেলে দলবল নিয়ে প্রীতিলতা ফেরার পথে পা বাড়ান। ফেরার রাস্তার পাশেই ছিল একটা নালা। ক্লাব আক্রমণের সময় সেখান থেকে পালিয়ে আসা এক ইংরেজ লুকিয়ে ছিল সেই নালার মধ্যে। নালার ভেতর শুয়েই এক বিপ্লবীকে খুব কাছ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে রিভলবার থেকে গুলি ছোঁড়ে ওই ইংরেজ। গুলি এসে লাগে প্রীতিলতার বুকে।

গুলি নাকি সায়ানাইড

বিপ্লবীদের কোনো অভিযানে অনেকসময় সৈনিকদের সাথে পটাসিয়াম সায়ানাইড (তীব্র বিষ) দিয়ে দেওয়া হয়। যদি এমন পরিস্থিতি আসে, যখন সে শত্রুর কাছ ধরা পড়ে যাচ্ছে - তখন তার কাজ হচ্ছে, নিজের কাছে থাকা অস্ত্রের সাহায্যে আত্মহত্যা করা। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ওই পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে ফেলা। অত্যাচারে মুখে দলের কোনো গোপন তথ্য যাতে বলে না ফেলে, তাই এই ব্যবস্থা। অর্থাৎ, আহত অবস্থায় শত্রুর হাতে ধরা না পড়ে আত্মহত্যা করা। গুলি খেয়েই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন প্রীতিলতা। ঠিক সেই মুহূর্তের মধ্যেই তিনি ঠিক করে ফেলেন নিজের শেষ কর্তব্য। প্রীতিলতাও সেই মুহূর্তে পালাবার কোনো উপায় না দেখে পটাসিয়াম সায়ানাইড মুখের মধ্যে ঢেলে দেন, জীবিত ধরা পড়ার ভয়ে। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ভারববর্ষের ইতিহাসের এক বীরকন্যা।

বাঙালি নারী চিরকাল কেবল অবলা নয়। যে বাঙালি নারী আজীবন গৃহের কোণে থাকে কেবলই সাংসারিক কাজকর্মে। সেই নারীকে তিনি চিনিয়েছেন দেশের জন্য, বিপ্লবের জন্য জীবন দিয়ে গর্জে ওঠা যায় এক মানুষ হিসেবে। তিনি বিশ্বকে দেখিয়েছেন বাঙালি নারীরাও দেশের জন্য লড়াই করতে পারে। তিনি শিখিয়েছেন বিপ্লবের জন্য স্বাধীনতার জন্য কী করে হার না মেনে চালিয়ে যেতে হয় এক জীবন। এক জন্মের কর্মে কেমন করে থেকে যেতে হয় মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায়।